পাঠককে ছাপা বইয়ে সংশ্লিষ্ট রাখা বইমেলার প্রধান সার্থকতা

বিপাশা মণ্ডল
০৮ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

অমর একুশে বইমেলা শুধু ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি চর্চা নয়। একুশ কী এবং কেন, একুশ কীভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সম্মানিত হলো, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একুশ কীভাবে বীজমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে- সেই অবশ্যমান্য ইতিহাসকে জাগরুক রাখতে অমর একুশে বইমেলা প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

একজন পাঠক বা দর্শনার্থী যখন শুধুমাত্র আনন্দ-বিনোদনের উদ্দেশ্যেও সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতে ও সেলফি তুলতে বইমেলায় প্রবেশ করে, তখন সে নিজের অজান্তে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশীদার হয়ে যায়। তার অবচেতনায় দেশপ্রেম, বাংলা ভাষার প্রতি বিশ্বস্ততা, নিজের মাটি ও শেকড়ের প্রতি মমত্ববোধ প্রোথিত হয়। বইমেলায় পা রাখা প্রতিটি মানুষ আসলে নিজের দেশীয় স্বকীয় অস্তিত্বকেই ধারণ করে। এভাবেই একুশের তাৎপর্য আরও জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে ক্রমাগত দিন

বছর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। একসময় মাতৃভাষা বাংলাদেশের বাঙালিদের জন্য ছিল সহজাত বিষয়, একুশে বইমেলা সেই মাতৃভাষার রক্তাক্ত আখ্যানের চেতনাকে আজ দেশের কেন্দ্র থেকে প্রান্তে সমকালীন সামাজিক ও বৌদ্ধিক চর্চায় রূপান্তর করার একটি সক্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

বাংলা একাডেমি ভাষা আন্দোলনের মূল্যবোধ ধারণ করে শুধু বইমেলার মাসে নয়, সারা বছরই নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে একুশের চেতনা সামনে আনার চেষ্টা করছে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি।

মেলাকেন্দ্রিক প্রকাশনা ও আলোচনাগুলো সমাজের প্রান্তিক, ভিন্নমত বা নতুন চিন্তার ধারাগুলোকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় বলে মনে করি। তবে প্রকাশনার ক্ষেত্রে মূলধারার বাণিজ্যিক চাহিদাকেই বেশি প্রাধান্য দেয় বলে মনে হয়। বর্তমান সামাজিক মাধ্যমের আগ্রাসী বাস্তবতা ও যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের বৈশ্বিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে মূলধারার বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে হলেও পাঠককে যদি অনুভব করানো সম্ভব হয়- বই পড়া দরকার। অর্থাৎ, পাঠক যদি স্বেচ্ছায় বাণিজ্যিক বইও সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ হন, তাই আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আজ একজন পাঠক যদি বাণিজ্যিক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, আগামীকাল হলেও তার চিন্তাজগতে বৈচিত্র্য আসতে পারে, আবার তার না হোক তার পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো সমাজের প্রান্তিক ভিন্নমত অথবা নতুন চিন্তার ধারাগুলো নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। পাঠককে যে কোনোভাবেই হোক ছাপা বইয়ে সংশ্লিষ্ট রাখাই বইমেলার প্রথম ও প্রধান সার্থকতা।

ডিজিটাল মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রবাহের যুগে এই মেলাকে জ্ঞান উৎপাদন ও পাঠক গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজ ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। সমাজের চিন্তার গতিপথকে প্রভাবিত করার মতো টেকসই বৌদ্ধিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হলে ঐতিহ্য, প্রযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে সুচারু সমন্বয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিক মেলার অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকাশকদের পুস্তক প্রকাশনা অথবা লেখকদের গ্রন্থ রচনার সংক্ষিপ্ত সীমায়িত লক্ষ্য নিয়ে এটা করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথমে ৩ বছর বা ৫ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। এরপর সেটাকে বড় ভাগে ভাগ করে প্রতি বছর অগ্রগতিমূলক আলাদা কার্যক্রম নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রতি বছরের কাজকে আবার চলমান বইমেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা করে প্রতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। ২০২৭ সালের একুশে বইমেলাকে প্রামাণ্য ধরে যদি তারা এগিয়ে যান, তাহলে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারীদের প্রতি ত্রৈমাসিক সভায় তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিবেচনা করে এগোতে পারেন। অর্থাৎ, অনেক বড় লক্ষ্যকে ছোট ভাগে ভাগ করে কিন্তু নিয়মিত কাজ করে এগিয়ে গেলে অবশ্যই ফলপ্রসূ পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু আমি জানি না, এই কাজটির সমন্বয় কে করবেন, কে নেতৃত্ব দেবেন, কারাই বা জবাবদিহিতার আওতায় থাকবেন।